لا اله الا الله محمد رسول الله

কলেমা দর্শন

মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

هو الناصر

কলেমা দর্শন

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে কলেমা প্রথম। কলেমা আরবী শব্দ। ইহার অর্থ শব্দ, কথা বা বাক্য। প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীতে শত সহস্র শব্দ ধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু ইহাদিগের সবগুলিকে কলেমা বলে না। যেগুলি অর্থবোধক উহাদিগকেই কলেমা বলা হয়। ইসলামি পরিভাষায় কলেমা বলিতে لا اله الا الله محمد رسول الله "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্" বাক্যকে বুঝায়। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলিয়াছেন, "ইসলাম পাঁচটি জিনিসের উপর স্থাপিত, যথা ঃ—(১) সাক্ষ্য দেওয়া لا اله الا الله محمد رسول الله "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্", (২) নামাজ কায়েম করা (৩) জাকাত দেওয়া, (৪) হজ্জ করা এবং (৫) রমজানের রোজা রাখা।" (বুখারী ও মুসলিম)।

এই কলেমা সম্বন্ধে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলিয়াছেন, "যে কেহ অকপট অন্তরে বিশ্বাসী হইয়া সাক্ষ্য দেয় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্", আল্লাহ্ তাহার জন্য অগ্নিকে হারাম করিয়া

দিবেন"। (বুখারী)। "যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহো মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্" পাঠ করে ও উহাতে কায়েম থাকিয়া মারা যায়, সে বেহেশতে যাইবে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

প্রশ্ন জাগে, কথা বা বাক্যকে কেন ধর্মের স্তম্ভ করা হইল এবং শুধু স্তম্ভই নহে, প্রথম স্তম্ভ করা হইল কেন। কথাকে কেন এত গুরুত্ব দেওয়া হইল? একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, কথা মানব জাতিকে সকল জীব হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছে এবং উহাই তাহাকে সৃষ্টির মাঝে প্রাধান্য দিয়াছে। বাক্য তাহাকে ভাষার বাঁধনে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে সতত প্রয়োজন সময়ে ব্যবহারের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে সাহায্য করিতেছে। তাহার বড় হইবার মূল ইহাই। আজ যদি তাহার কথা বন্ধ হইয়া যায়, কাল সে অপরাপর জীবের সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে আজ জানা গিয়াছে যে, আদিতে এমন এক সময় ছিল, যখন মানুষ ও অপরাপর জীবের মধ্যে প্রভেদ ছিল না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা এই জামানা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "নিশ্চয়ই মানব জাতির উপর এক জামানা গিয়াছে, যখন সে কোন উল্লেখের বস্তু ছিল না।" (সুরা আদ-দহর, প্রথম আয়াত)। ইহা ঐ সময়ের কথা যখন কথার পুঁজি তাহার কিছুই ছিল না। তাই সৃষ্টির মাঝে তখন তাহার কোন স্বাতন্ত্র্যও ছিল না। ইহার পর আল্লাহ্তায়ালাই তাহাকে কথা বলিতে শিক্ষা দেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন, "রহমান খোদা কোরআন শিখাইয়াছেন, তিনি মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাহাকে ভাষণ (কথা বলিতে) শিখাইয়াছেন।" (সুরা রহমান, প্রথম রুকু)। এই শিক্ষা তিনি হযরত আদমের মারফৎ দেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন, "এবং তিনি আদমকে সকল বস্তুর নাম শিখাইলেন।" (সুরা বকর, ৪র্থ রুকু)। কালের গতিতে তাহার কথার

সম্পদ যতই বাড়িয়া চলিতে লাগিল, ততই অপরাপর জীব হইতে তাহার বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হইয়া সৃষ্টির মাঝে তাহার আসন উর্ধে উঠিতে লাগিল। কিন্তু কথার উন্নতির উৎস তাহার বরাবর আকাশেই বাঁধা রহিয়াছে। নবীর পর নবী আসিয়াই তাহার কথার সম্পদকে বাড়াইয়াছে। ওহি অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার বাণীর মারফৎ মানব জাতিকে তাহার সঙ্কটকালে নবীগণ বারে বারে যুগোপযোগী জ্ঞান ও আদর্শ চরিত্র দিয়াছে, যাহা তাহার উন্নতির দ্বারকে সদা বিস্তৃত করিয়া চলিয়াছে। সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞান ও আদর্শের ভাণ্ডার পবিত্র কোরআন। আল্লাহ্তায়ালা এই কথাই সুরা রহমান হইতে উদ্ধৃত আয়াতে বলিয়াছেন।

আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কোরআনে সুরা বকরের ৪র্থ রুকুতে বলিয়াছেন যে, তিনি আদমকে অর্থাৎ মানবকে পৃথিবীতে তাঁহার খলিফা রূপে সৃষ্টি করিতে চাহেন এবং তাহার এই খেলাফতের মূল রহস্য তাহার মধ্যে কথা প্রকাশের নিমিত্ত বাকশক্তিতে নিহিত রহিয়াছে, যে বিষয়টি ফেরেশ্তাগণও বুঝিতে পারে নাই। হাদিসে আছে যে, আল্লাহ্তায়ালা আদমকে আপন স্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই স্বরূপের প্রকাশ কথার মধ্যবর্তিতায় হইয়াছে। আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং যেরূপ "কুন্ ফা ইয়াকুন" অর্থাৎ "হও এবং হইয়া যায়" (সুরা ইয়াসিন, শেষ রুকু) শক্তির পূর্ণ অধিপতি. সেইরূপ তিনি মানবকে আপন খলিফা করার উদ্দেশ্যে তাহাকে এই শক্তির ক্রমঃ উন্নতিশীল অধিকারী করিয়াছেন। কথা-শক্তির গুণেই মানব ক্রমঃ উন্নতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন যে, তিনি "কুন" শব্দের আদেশ দ্বারা বিশ্বচরাচর ও তন্মধ্যস্থিত সব কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম পুস্তকেও ইহার সমর্থন রহিয়াছে। কথা মহাশক্তির

উৎস। "আল্লাহ্তায়ালার কথা সর্ব উচ্চ।" (সুরা তওবা—৬ষ্ঠ রুকু)। আসমান জমিন টলিতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার কথা টলে না। তিনি যাহা কিছু বলেন তাহাই হয়। ঈদৃশভাবে শব্দকে সৃষ্টির উৎসে দেখিয়া কোন কোন জাতি ভ্রমক্রমে শব্দকেই সৃষ্টিকর্তা বলিয়া মনে করিয়াছে। হিন্দুরা বলিয়া থাকে, "শব্দই ব্রহ্ম"। শিখ সম্প্রদায় গ্রন্থ সাহেবকে পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু আমার কথা যেমন আমি নহি, তদ্রূপ আল্লাহ্তায়ালার বাণীও আল্লাহ্ নহে। আবার অনেকে আল্লাহ্তায়ালার বাণীবাহক নবীকেও ঐ বাণীর গুণে খোদা বলিয়া ভ্রম করে। তিনি যাহা বলেন, তাহাই ঘটে দেখিয়া তাহাদিগের এই ভ্রম হয়। কিন্তু রাজার বাণী বাহক যেমন রাজা হয় না, সেইরূপ আল্লাহ্তায়ালার প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ব্যাক্তিও আল্লাহ্ হন না। সত্যকথা হইল, আল্লাহ্তায়ালার বাণী কোন মানবের মধ্যে অবতীর্ণ হইলে, ঐ মানব সৃষ্টির মধ্যে এক অপরূপ শক্তিরূপে দৃষ্টিগোচর হন। তিনি পৃথিবীতে খোদার প্রতিচ্ছায়ারূপে প্রকাশিত হন। তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শ মানব জাতির মধ্যে সভ্যতার নব নব সৃষ্টির প্রবাহ জাগায়। বাণী ও বাণীবাহক নবীকে তাই বারে বারে পরবর্তী কালের মানব জাতি খোদা ভ্রমে পূজা করিয়াছে। নবীর স্বয়ং সৃষ্ট হওয়ার কথা বিস্মৃত হইয়া শুধু তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি ও সৌন্দর্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পতিত মানব জাতি তাঁহাকে স্বয়ং অথবা যে বাণী তাঁহাকে আধ্যাত্মিক স্বরূপ দান করিয়াছে উহাকে উপাস্য মনে করে। এইরূপ পতিত মানবজাতি নবী বা মন্ত্রের পূজা শুরু করিয়া থাকে। বস্তুতঃ, নবী আল্লাহ্তায়ালার খলিফা হইয়া থাকেন এবং তিনি আপন আদর্শ মানব জাতির সম্মুখে পেশ করিয়া, তাঁহার অনুসরণে প্রত্যেক মানবকে ইহলোকে আল্লাহ্তায়ালার খলিফা হওয়ার সুযোগ দান করিয়া থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা নবীকে একদল প্রত্যাখান

করিয়া অধঃপাতে যায় এবং অপর দল, যাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করে, তাহাদিগের বংশধরগণ পরবর্তীকালে তাঁহাকে খোদারূপে পূজা করিতে থাকে। এইভাবে আল্লাহ্তায়ালার কালাম, "যাহারা কাফের তাহাদিগের বাক্যকে সর্ব নিকৃষ্ট করিয়াছি এবং আল্লাহ্তায়ালার বাক্য সর্বোচ্চ।" (সুরা তওবা—৬ষ্ঠ রুকু) সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

সুতরাং, বুঝা গেল মানব জাতির জন্য কথা সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ। আমরা সচরাচর দেখি, যে যত সুন্দর করিয়া কথা কহিতে পারে, মানুষ তাহার প্রতি তত বেশী আকৃষ্ট হয়। অতএব বাক্যকে ধর্মের প্রথম স্তম্ভ করা একান্ত সমীচীন হইয়াছে। কিন্তু সকল কথাই মূল্যবান নহে। যে কথা মানবের জন্য যত জরুরী, সেই কথা অনুপাতে তত বেশী মূল্যবান এবং সর্বাপেক্ষা মূল্যবান কথা, সেইটি, যাহা তাহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও সিদ্ধি-পথের সন্ধান দেয়। মানব, সৃষ্ট জীব হিসাবে আপন সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও উহার সিদ্ধির পথ স্বয়ং নির্ধারণ করিতে অক্ষম। এই দুয়ের সন্ধান একমাত্র সৃষ্টি কর্তার হাতে।

প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর জন্য উন্নতির পৃথক পৃথক সোপান নির্ধারিত রহিয়াছে। কোন বস্তু উন্নতি করিতে করিতে যেখানে যাইয়া থামিয়া যায়, উহাই তাহার সৃষ্টির গন্তব্যস্থল। গোবৎস বড় হইয়া এক দিকে গাভী হইয়া দুগ্ধ দান করে এবং অপর দিকে বলদ হইয়া লাঙ্গল টানে, গাড়ি টানে ও ভারবহন করে এবং ইহাই তাহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা ও পরে গাছে পরিণত হইয়া ফলদান করাই উহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য। মানুষকে দর্শন, বিজ্ঞান, অঙ্ক, অর্থ ও রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি নানা জ্ঞানের চর্চা করিতে দেখা যায়। আবার কেহ ভোগ বিলাসের নানা ধারায় গা ভাসাইয়া দেয়। কিন্তু পরিণামে তাহারা পরিতৃপ্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করে না। কারণ ঐগুলি মানব জীবনের লক্ষ্য নয়। তবে একদল লোককে পরিতৃপ্ত হইতে দেখা

যায়। তাঁহারা হইলেন আল্লাহ্‌তায়ালার নবী এবং তাঁহাদিগের সত্য অনুসরণকারী দল। তাঁহারাই তৃপ্তি ও শান্তির সহিত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন, "এবং আমরা জীন ও ইনসানকে সৃষ্টি করি নাই, পরন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদতের জন্য।"—(সুরা জারিয়াত, তৃতীয় রুকু)। "জানিয়া রাখ, আত্মার শান্তি আল্লাহ্‌তায়ালার স্মরণে।"—(সুরা আর রাদ,—চতুর্থ রুকু)। আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদত ও তাঁহার স্মরণের উদ্দেশ্য, তাঁহার মিলন। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন, "সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার মিলন চায়, তাহাকে নেক আমল ও আপন রবের শেরকমুক্ত এবাদত করিতে হইবে।"—(সুরা কাহাফ, শেষ আয়াত)। আল্লাহ্‌তায়ালার কালামের সহিত আমাদের অভিজ্ঞতাও মিলিয়া যায়। আল্লাহ্‌-তায়ালার এবাদত ও তৎসাহায্যে তাঁহাকে লাভ করার মধ্যে মানবের পার্থিব চাওয়া থামিয়া যায়। সুতরাং ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, মানব জীবনের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত মিলন এবং ইহা সিদ্ধির পথ তাঁহার সত্য এবাদত।

কোন স্থায়ী বড় কাজ করিতে হইলে আমরা পূর্ব হইতে উক্ত কাজের এক পরিকল্পনা এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে এক নকশা করিয়া লই। পরিকল্পনা ও নকশা যত সুস্পষ্ট হয়, আমাদের কাজও তত সুন্দর ভাবে সিদ্ধ হয়। আল্লাহ্‌তায়ালাও যেহেতু মানবকে এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং তাহার জন্যও এক পরিকল্পনা ও নকশার প্রয়োজন ছিল। এবাদত যেহেতু মানবের উদ্দেশ্য সাধনের সোপান ছিল, এই জন্য তিনি হযরত আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া নবীর পর নবীর মারফৎ যুগে যুগে মানবজাতিকে প্রয়োজনীয় পার্থিব জ্ঞানের সহিত এবাদত শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। ক্রমঃবিবর্তনের নিয়মে মানবের মস্তিষ্ক ও মন যেমন পূর্ণতার দিকে আগাইয়াছে,

তেমনি তাহার এবাদতের পদ্ধতিকেও তদনুযায়ী উন্নত করা হইয়াছে। কিন্তু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে মানবের মস্তিষ্ক পরিপক্ব হয় নাই এবং তখন লিখার যুগ ছিল না। তখন ধর্মের সকল কথা মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করিত। সুতরাং পূর্ণ পরকিল্পনা ও নকশার জন্য উহা উপযুক্ত সময় ছিল না। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর যুগে যেমন মানবের বুদ্ধি যৌবনের প্রথম প্রভাতে পদার্পণ করিল ও তাহার মস্তিষ্ক পরিপক্কতা লাভ করিল, তখন হইতে আল্লাহ্তায়ালা লেখার বাঁধনে বাক্যকে বাঁধিয়া মানবের জন্য উন্নতি নির্দিষ্ট করিলেন। এ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন, "কসম! কলম ও দোয়াতের এবং উহারা যাহা লিখে; তোমার রবের অনুগ্রহে তুমি পাগল নহ এবং নিশ্চয়ই তোমার জন্য নির্দিষ্ট আছে পুরস্কার, যাহা কখনও নিঃশেষ হইবে না এবং নিশ্চয় অতীব মহান তোমার নৈতিক চরিত্র। ইহা তুমি (বর্তমান কালে) উপলব্ধি করিবে এবং তাহারাও (ভবিষ্যৎ কালের মানব জাতিও) উপলব্ধি করিবে।" (সুরা কলম, প্রথম রুকু)। এই আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন যে, ইহার পর লিখার যুগ আরম্ভ হইল। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) প্রদত্ত শিক্ষা ও চরিত্র লিপিবদ্ধ আকারে মানব জাতির মধ্যে স্থান লাভ করিবে এবং ঐ লেখা কেহই খণ্ডন ও রদবদল করিতে পারিবে না এবং তাঁহার আদর্শ যে অতীব মহান ইহা সর্ব কাল সাক্ষ্য দিবে। ইহা সকলেই জানেন যে, যখন এই আয়াত নাজেল হইয়াছিল, তখন পুস্তকের প্রচলন হয় নাই। মুসলমান জাতির অভ্যুত্থানের সহিত পুস্তকের প্রচলন ও বিস্তার আরম্ভ হইয়া গেল। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এবং ইসলামের বিরুদ্ধে কালি কলম দিয়া পর্বত প্রমাণ পুস্তক লিখা হইয়াছে, কিন্তু আজ আবার যুগ নবী হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর হাতের কালি কলম উহাদের চরম খণ্ডন করিয়া উল্লিখিত আয়াতের সত্যতা

সপ্রমাণ করিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা কলম ও দোয়াতের কসম খাইয়া এই সত্যতারই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। পবিত্র কোরআন সম্বন্ধে সুরা বকরের গোড়ার কথাই হইল, "এই পুস্তক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।" এই আয়াতের নজুলের সময় ইহা মানবের কল্পনাতীত ছিল যে, পবিত্র কোরআন কখনও পুস্তকের আকার লাভ করিবে। অথচ ইহার কত অল্প সময় পরেই না পবিত্র কোরআন বহুল প্রচারিত এক অতীব মহান পুস্তকে পরিণত হইল। সুতরাং ইহাই উপযুক্ত অবসর ছিল মানব জাতির জন্য পূর্ণ ধর্ম দেওয়ার। এই আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কোরআনের ভবিষ্যৎ যুগের সমস্ত অলিখিত পুস্তকের মোকাবেলায় ত্রুটিশূন্য হওয়ার চ্যালেঞ্জ দিয়াছেন। ইহা আজ কত বড় সত্য। ফলতঃ আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর মারফৎ মানব জীবনের পূর্ণ পরিকল্পনা ও নকশা দিলেন এবং এতদুভয়কে এক মহান বাক্যের মধ্যে বাঁধিয়া দিলেন। ইহা যেন তিনি সিন্ধুকে বিন্দুর মধ্যে ভরিয়া মানবের হাতে এক পূর্ণ হেদায়েতের দর্পন স্বরূপ দিলেন। সেই মহান বাক্য হইল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহো মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্‌," যাহাকে কলেমা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই কলেমার মোটা অর্থ হইল, "আল্লাহ্‌ ব্যতীরেকে কোন উপাস্য নাই, (হযরত) মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁহার প্রেরিত পুরুষ।" কলেমার "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌" অংশে মানব জীবনের জন্য পরিকল্পনা প্রদত্ত হইয়াছে এবং "মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্‌" হইল উহার নকশা—অর্থাৎ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌" কলেমার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি হইলেন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)। আবু দাউদের হাদিসে আছে যে হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "পবিত্র কোরআন তাঁহার চরিত্র লেখা।"

কলেমার প্রথম অংশে আছে আল্লাহ্‌তায়ালার উপাসনার শিক্ষা,

যাহা পূর্ববর্তী সকল নবীই দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু যেহেতু তাঁহাদিগের শিক্ষা অস্থায়ী ও অপূর্ণ ছিল, এই জন্য আল্লাহ্তায়ালা পূর্ববর্তী কোন নবী ও তাঁহার জাতিকে ধর্মের ভিত্তি স্বরূপ কোন কলেমা দান করেন নাই। একমাত্র মুসলমান জাতিকে তিনি এই সৌভাগ্য দান করিয়াছেন এবং ইসলামকে সমগ্র মানব জাতির জন্য নির্দিষ্ট করিয়া, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মারফৎ সমগ্র মানব জাতিকে কলেমার কল্যাণে ভূষিত করিয়াছেন।

হযরত আদম (আঃ) হইতে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সকল নবী 'পূর্ণ পরিকল্পনা ও নকশার আধার' কলেমা লাভের জন্য মানবকে সাধনা করিতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, স্বয়ং কোন কলেমা কেহ দেন নাই। তাঁহাদিগের সাধনা কবির ভাষায়ঃ—

"আমার লাগে নাই সে সুর,
আমার বাঁধে নাই সে কথা।
শুধু প্রাণেরই মাঝখানে,
আছে গানের ব্যাকুলতা।
আজো ফুটে নাই সে ফুল,
শুধু বহেছে এক হাওয়া।"

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আল্লাহ্তায়ালা অনাদী ও অনন্ত। তাই তিনি স্বীয় নামের সহিত অস্থায়ী ও অপূর্ণ শিক্ষা আনয়নকারী এই সকল নবীদের নাম সংযুক্ত করিয়া কোন কলেমা দান করেন নাই। কিন্তু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে যেহেতু তিনি পূর্ণ ধর্ম দান করিয়াছেন এবং তাঁহার শিক্ষাকে সর্বজাতির জন্য বাধ্যতামূলক করিয়াছেন এবং যেহেতু তাঁহার প্রদত্ত ধর্ম কেয়ামত পর্যন্ত সচল থাকিবে, এই জন্য আল্লাহ-

তায়ালা স্বীয় নামের সহিত তাঁহার নাম সংযুক্ত করিয়া এক পূর্ণ ও পবিত্র কলেমা দান করিলেন।*

কিন্তু, দুঃখের বিষয়, যে সম্মান আল্লাহ্‌তায়ালা একমাত্র মুসলমান জাতিকে দান করিয়াছেন, মুসলমানগণ তাহাদিগের অধঃপতন কালে সেই সম্মান কলেমা বিহীন সকল জাতির উদ্দেশ্যে তাহাদিগের নবীর নামে কলেমা রচনা করিয়া বিলাইয়া দিয়াছে। এই মনগড়া কলেমাগুলির সমষ্টি "দোয়া-এ-গঞ্জল আরশ" নামে সকলের নিকট পরিচিত। পৃথিবীতে আজও বহু নবীর উম্মত বর্তমান। কিন্তু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে "দোয়া-এ গঞ্জল আরশ" বর্ণিত কলেমার কোন তসদিক ঐ সকল জাতির নিকট হইতে পাওয়া যাইবে না। কথায় বলে, 'বাদী নীরব, সাক্ষী মুখর'।

কলেমাকে আমি জীবনের সব থেকে জরুরী বাক্য বলিয়াছি। আসুন এখন আমরা কলেমার অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, উহা কিভাবে আমাদিগকে জীবনের পরিকল্পনা ও নকশা দিয়াছে।

"লা ইলাহা" কথার অর্থ, "নাই, কোন উপাস্য।" ইলাহ শব্দের অর্থ ভয়, ভক্তি ও ভালবাসার পাত্র। দেখা যায় তিন প্রকারের মনোভাব যথা—ভয়, ভক্তি ও ভালবাসা দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানুষ অনেক বড় বড় ন্যায় ও অন্যায় কাজ করিয়া থাকে। নিম্নস্তরের

---

* "অদ্য তোমাদিগের ধর্ম্মকে তোমাদিগের জন্য পূর্ণ করিয়া দিলাম। এবং ইসলামকে ধর্ম হিসাবে তোমাদিগের জন্য মনোনীত করিলাম।" (সুরা মায়েদা, ১ম রুকু)। "এবং যে কেহ ইসলাম ছাড়া অপর ধর্ম পছন্দ করিবে, ইহা তাহার নিকট হইতে কবুল করা হইবে না।" (সুরা আল-এমরান, ৯ম রুকু)।

"তুমি কেবল মাত্র সাবধানকারী এবং প্রত্যেক কওমের জন্য পথ প্রদর্শক।" (সুরা আর রাদ, ১ম রুকু)।

জীবের মধ্যে ভয়ের ভাব প্রবল ও অপর দুইটি ভাবের স্ফুরণ অতি অল্প আকারে দেখা যায়। উচ্চস্তরের জীবের মধ্যে যত বেশী ভাবের বিকাশ হয়, উহাদিগের মধ্যে শেষোক্ত দুইটি ভাবের আনুপাতিক উন্নতি দেখা যায়। পক্ষান্তরে মানব ছাড়া সকল জীবের আপন সন্তানদের প্রতি মমতা ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি তাহাদিগের বয়ঃবৃদ্ধির সহিত কমিয়া যায়। কিন্তু জীবনের অগ্রগতির সহিত মায়াপথের বাঁধনে মানবের আপন সন্তানের প্রতি মমতা এবং গুরুজনের প্রতি ভক্তি বাড়িয়াই চলে। স্বজাতির প্রতি তাহার অনুরাগ অপরাপর জীব অপেক্ষা অধিক। এই বৈশিষ্ট্য মানবকে অপরাপর জীব হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। মানুষকে আরবী ভাষায় ইনসান বলা হইয়াছে। এই শব্দ 'উনস' (মমতা) ধাতু হইতে উৎপন্ন। সুতরাং ইনসান এমন এক জীব, যে আপন জাতির জন্য বিশেষ মমতা রাখে। তাহার মমতার ইন্দ্রজাল এরূপ ক্রিয়াশীল যে তাহার স্পর্শে আসিয়া অপরাপর জীবের মধ্যেও মমত্ববোধ ফুটিয়া উঠে এবং যে সব জীব তাহার সাহচর্যে যত বেশী থাকে, সেই সব জীবের মধ্যে তত বেশী মমতার প্রকাশ হয়। যাহা হউক, আমরা যে তিনটি মনোভাবের কথা বলিয়াছি, উহাদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানব আপন অতীত অভিজ্ঞতার মূলে আমল করা বা না করার ফলে কম বা বেশী ফায়দা উঠায়। সুতরাং 'লা ইলাহা' কথার নির্দেশ অনুযায়ী 'লা' অর্থাৎ 'নাই' শব্দের তরবারী হাতে করিয়া যখন হৃদয় হইতে সকল 'ইলাহ' অর্থাৎ সকল ভয়, ভক্তি ও ভালবাসার পাত্রের মাথা কাটিয়া শেষ করা হয়, তখন যাঁহাকে শেষ করা যায় না এবং যে অস্তিত্ব থাকিয়া যায়, তাঁহারই সন্ধান কলেমার পরবর্তী অংশে 'ইল্লাল্লাহ্' অর্থাৎ 'ব্যাতিরেকে আল্লাহ্' কথায় বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' অংশের অর্থ হইল আল্লাহ্তায়ালার মোকাবেলায় ভয়, ভক্তি ও ভালবাসার যে কোন পাত্র আসিয়া পথ

রোধ করিবে, উহাকে আল্লাহ্‌তায়ালার সম্মুখে কোরবানী করিতে হইবে। তাহা হইলে 'আল্লাহ্' লাভ ঘটিবে। প্রত্যেক ছোট বস্তুকে উচ্চ ও উচ্চতর বস্তুর সম্মুখে ক্রমান্বয়ে স্তরে স্তরে কোরবানী করিয়া যাইতে হইবে। শেষ যাহা, উহাকে যখন শেষ করা যায়, তখনই মানব আপন গন্তব্যস্থল আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট পৌঁছে। কিন্তু জড়ের সীমা রেখার মধ্যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যে কোন ছোট বস্তুকে উচ্চ বস্তুর সম্মুখে ভয়, ভক্তি ও ভালবাসার স্বতঃস্ফূর্তভাবের বশে বলি দেওয়া সহজ, কিন্তু যিনি জড় নহেন, যিনি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যের অতীত এবং যিনি সাধারণভাবে জানার বাহিরে, তাঁহার জন্য সাক্ষাৎ ভয়, ভক্তি এবং ভালবাসার পাত্রকে কোরবানী করা অতীব কঠিন। যাঁহাকে চোখে দেখা যায় না, তাঁহাকে সদা হাজির জ্ঞান করিয়া কাজ করা সহজ কাজ নহে। মানব প্রত্যেক কাজের জন্য এক আদর্শ বা নমুনার মুখাপেক্ষী। অতএব এ হেন সুকঠিন কর্তব্য সাধনের জন্য এক অতীব মহান আদর্শের প্রয়োজন তাহার। কলেমার শেষাংশে সেই আদর্শের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। উহা হইতেছে, "মোহাম্মাদুর রাসুল্লাহ্", অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রসুল মোহাম্মাদ (সাঃ)। আল্লাহ্‌তায়ালাকে লাভ করিবার জন্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর অনুশীলন করিতে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) মানব জাতির উৎকৃষ্ট আদর্শ। আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসুল হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর মধ্যে উৎকৃষ্ট আদর্শ রহিয়াছে তাহার জন্য, যে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের আশা করে এবং আল্লাহ্‌কে খুব বেশী স্মরণ করে।" (সুরা আহ্‌জাব, ৩য় রুকু)। আরো বলেন, "বল, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাহা হইলে আমার (অর্থাৎ হযরত মোহাম্মাদ সাঃ-এর) অনুসরণ কর, (তাহা হইলে) আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন।" (সুরা এমরান, ৪র্থ রুকু)। সুতরাং "মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্,"

কথার মধ্যে ইহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার রসুল হওয়াতেই আমাদিগের এ সৌভাগ্য। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বাক্যের পূর্ণ আমল দ্বারা যে মানব গঠিত হইয়াছেন, তিনি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এবং তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার পূর্ণ খলিফা। এই সাধনা কোন কল্পিত জ্ঞান দ্বারা সম্ভব হয় নাই। আকাশ হইতে অবতীর্ণ জ্ঞান ধারার সাহায্যেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। এই কথাই 'রসুলুল্লাহ্' শব্দের মধ্যে ব্যক্ত করা হইয়াছে। তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার ওহির নির্দেশ দ্বারা পরিচালিত হইয়া 'লা' শব্দের তরবারী হস্তে আল্লাহ্‌তায়ালার সমক্ষে সকল ভয়, ভক্তি ও ভালবাসার পাত্রকে কোরবানী করিতে করিতে আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে এরূপ ভাবে অগ্রসর হইলেন যে, জীব্রাঈল (আঃ) যিনি তাঁহাকে ইসলাম শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহাকেও ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন। আল্লাহ্‌তায়ালার দর্শন লাভের নিমিত্ত মে'রাজের রাতে যখন হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে জীব্রাঈল (আঃ) পথ দেখাইয়া যাইতে লাগিলেন, তখন তাঁহাকে এক স্থানে আসিয়া থামিয়া যাইতে হইল। তিনি বলিলেন, "এক চুল পরিমাণ যদি আমি আগে যাই, জ্যোঃতির স্ফূরণ আমার ডানা পুড়াইয়া দিবে।" কিন্তু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) তাঁহাকে ছাড়াইয়া আগাইয়া গেলেন, এমন কি আল্লাহ্‌তায়ালা হইতে মাত্র এক ধনু দূরে উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বয়ং অজানাকে জানিলেন এবং তাঁহাকে জানিবার পথ মানব জাতিকে জানাইলেন ছোট একটি কলেমায়।

হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" কলেমাকে "উৎকৃষ্ট জেকের" বলিয়াছেন। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, পূর্ববর্তী নবীগণেরও শিক্ষার বস্তু ইহাই ছিল। কিন্তু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর অতীব মহান আদর্শ চরিত্রের দ্বারা এই কলেমা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া মানব জাতির জন্য রূপ ধারণ করিল। এখন একমাত্র হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর

শিখান "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" কলেমাই আল্লাহ্তায়ালার নিকট মকবুল। মুসলমান সাধারণ আজ এই কলেমা পাঠের ফলে বেহেশ্ত লাভের ওয়াদাকে ভুল বুঝিয়া কর্তব্যে অবহেলা করিয়াছে। এই ভয় হযরত উমর (রাঃ) করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য তিনি ঐ কথা সাধারণে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে নির্দেশ দেন, তিনি পথে যাইতে প্রথম যে ব্যক্তিকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্" পড়িতে দেখিবেন, তাহাকে যেন বেহেশ্তের শুভ সংবাদ দেন। আবু হোরায়রা (রাঃ) এই শুভ সংবাদ হযরত উমর (রাঃ)-কে জানাইলেন। তিনি ইহা শুনিয়া আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে এক চপেটাঘাত করেন। অতঃপর উভয়ে রসুল করীম হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর দরবারে পৌঁছিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে উমর (রাঃ) তুমি ঐরূপ আচরণ করিলে কেন?" তিনি বলিলেন, "হে রসুলুল্লাহ্! আমার বাপ-মা আপনার জন্য উৎসর্গকৃত হউক। আপনি কি আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে এই আদেশ দিয়া পাঠাইয়াছেন যে, তিনি যাইয়া যাহাকে অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত কলেমা পাঠ করিতে দেখিবেন, তাহাকেই বেহেশ্তের শুভ সংবাদ দিবেন?" তিনি বলিলেন, 'হাঁ'। তখন হযরত উমর (রাঃ) বলিলেন, "ইহা করিবেন না। আমার ভয় হয়, মানুষ ইহা শ্রবণ করিয়া কর্মে শৈথিল্য দেখাইবে। সুতরাং, তাহাদিগকে কাজ করিতে দিন।" তখন রসুল (সাঃ) বলিলেন, "তাহাদিগকে সেই ভাবেই ছাড়িয়া দিন।" (মুসলিম)। এই হাদিসের সারমর্ম হইল প্রত্যেক মানুষকে কর্মী হইতে হইবে। নচেৎ সফলতা আসিবে না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন, "কসম সেই অস্তিত্বের যিনি মৃত্যু এবং জীবনকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবেন যে, তোমাদের মধ্যে কে উৎকৃষ্ট আমল করে।"

(সুরা মুল্‌ক, ১ম রুকু)। যে বিশ্বাসের মূল অন্তরে স্থান লাভ করে, উহা কাজে প্রকাশিত না হইয়া পারে না। যে কথা মানুষের শুধু জিহ্বা মূলে থাকে এবং অন্তরে প্রবেশ করে না, উহা পাথরের উপর বীজ বপন সদৃশ হয়।

জীবনে আমরা অনেক প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি, কর্ম্মক্ষেত্রে সেগুলিকে সত্যরূপে পালন করিয়া থাকি। বিবাহের সময়ে আমরা কোন এক নারীকে এক ওয়াদা করিয়া স্ত্রীরূপে গ্রহণ করি। বিবাহের পরে পরেই আমাদের ওয়াদার কাজ শেষ হইয়া যায় না। পরন্ত উহার দায়িত্ব দিনে দিনে বর্দ্ধিত হয়। পুত্র কন্যার জন্ম ও তাহাদিগের বয়ঃবৃদ্ধির সহিত আমাদিগের কর্তব্য এবং দায়িত্বও বাড়ে। সুতরাং, বিবাহের প্রতিজ্ঞাকে আমরা যেরূপ গুরুত্ব দান করিয়া সর্বদা উহার বর্ধনশীল দায়িত্ব বহন করিয়া থাকি, সেইরূপ যদি কলেমার সাক্ষী দিয়া আমরা উহার অন্তর্নিহিত দায়িত্ব পলে পলে স্বীয় জীবন মাঝে পালন করিয়া যাই, তবেই কলেমা পড়া আমাদের জন্য সার্থক হইবে এবং উহা আমাদিগকে ইহকালে শান্তি দিবে ও পরকালে জান্নাতের অধিকারী করিবে। নচেৎ আমাদিগের কলেমার প্রতিজ্ঞা ভণ্ডামি বলিয়া গণ্য হইবে। "এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যাহারা মুখে বলে ঃ আমরা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখি এবং তাহারা একেবারেই মোমেন নহে।" (সুরা বকর, ২য় রুকু)। কলেমার উচ্চারণই বেহেশ্‌তে যাইবার জন্য যথেষ্ট হইলে, উহাকে উৎকৃষ্ট জেকের বলা হইত না। যে কথা মানুষের সদা স্মরণে জাগে, উহা তাহাকে কর্মে আগ্রহশীল, যত্নবান ও তৎপর করে। স্মৃতিপটে সদা জাগরুক কথা এক তরবারী স্বরূপ, যাহা হুশিয়ার সৈন্যের ন্যায় মানুষ প্রয়োজন সময়ে অকুণ্ঠচিত্তে অবশ্য ব্যবহারে আনে। প্রয়োজন মুহূর্তে তরবারীর ব্যবহারে অবহেলা যেমন সিপাহীর জীবন বিপন্ন করে, মুখে কলেমা পাঠ করিয়া উহার সাধনার অবহেলা করিলে আমাদিগের অনুরূপ

ক্ষতি সুনিশ্চিত। যাহারা কলেমার মর্ম বুঝিয়া আন্তরিকভাবে জেকের করে তাহাদিগের জেকের কর্মের মধ্যে সদাই ধ্বনিত হয়। তাহারাই সফলকাম এবং তাহাদের জন্যই ইহকালে শান্তি ও পরকালে জান্নাত রহিয়াছে।

অনেকে নানা উচ্চারণ ও অঙ্গ ভঙ্গি সহকারে পাড়ার মানুষের শান্তি ভঙ্গ করিয়া কলেমার জেকের করিয়া থাকে। কিন্তু কোরআনে এরূপ জেকেরের অনুমোদন নাই এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁহার সাহাবাগণ এরূপ জেকের কখনও করেন নাই। উচ্চৈস্বরে জেকেরকে কোরআনে গাফেলের কাজ অর্থাৎ অন্তসারশূন্য বলিয়াছে এবং হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ইহা নিষেধ করিয়াছেন। "এবং স্মরণ কর তোমার রবকে বিনয় ও ভয়ের সহিত এবং উচ্চৈস্বরে নহে, সকাল ও সন্ধ্যায় এবং গাফলগণের অন্তর্ভূক্ত হইও না।" (সুরা আরাফ, শেষ রুকু)। জেকের শুধু মুখে হইলে চলিবে না, উহা কর্মে প্রকাশ করিতে হইবে। হযরত উমর (রাঃ)-এর ন্যায় আমাদিগকে কলেমার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে। যেদিন তিনি তাঁহার শক্ততার তরবারী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পদতলে রাখিয়া এই কলেমা পাঠ করিলেন, সেই দিন হইতে তাঁহার জানমাল সবকিছুই ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত হইয়াছিল। একদা দীনের জন্য হযরত ওসমান (রাঃ)-এর কোরবানী দৃষ্টে হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছিলেন, "ইহার পর তিনি যাহাই করুন না কেন, তাঁহার কাজে কোন কৈফিয়ৎ হইবে না"। (তিরমিজি)। ইহার অর্থ এ নয় যে, তিনি ইহার পর অন্যায় কাজ করিবার অনুমতি পাইলেন; পরন্ত এ কথার তাৎপর্য এই যে কলেমা নিহিত আদর্শ তাঁহার চরিত্রে এরূপভাবে নিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, তাঁহার দ্বারা ইহার পর এরূপ কোন কাজ হইতেই পারে না যাহাতে তাঁহার কৈফিয়তের কোন প্রশ্ন উঠে। তাঁহারাই কলেমার প্রকৃত

সাক্ষী। এইরূপ কলেমার অধিকারীগণের দ্বারাই জগতে বিস্ময়কর কীর্তি স্থাপিত হয়। যদি কলেমাকে আমাদিগের জীবনে এক মূর্তিমান আদর্শ করিয়া তুলিতে পারি, তবেই আমরা জীবনে সফলকাম হইব এবং আল্লাহ্তায়ালাকে লাভ করিব। আমরা কলেমার ফজিলত সম্বন্ধে এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে যে হাদিস বর্ণনা করিয়াছি, উহাতেও ইহা স্পষ্ট বলা আছে যে, অপকট হৃদয়ে বিশ্বাস করিয়া কলেমার সাক্ষ্য প্রদানকারী ও উহাতে যে কায়েম থাকে তাহারই জন্য বেহেশ্ত নির্দিষ্ট। এই সকল কথা বেহেশ্তকামীকে কর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দিতেছে।

আল্লাহ্তায়ালা এবং মানবের মধ্যে অসংখ্য তামস ও জ্যোঃতির পর্দা বিরাজমান। তামস পর্দাগুলি নফস হইতে উদ্ভূত এবং জ্যোঃতির পর্দাগুলি আসমান হইতে বিলম্বিত। তামস পর্দাগুলি আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্বের উপর মানব মনে যবনিকা টানিয়া রাখে এবং আলোকের পর্দাগুলি অপরিষ্কৃত ও অপরিপক্ক হৃদয়ে খোদা ভ্রমের সৃষ্টি করে। উভয় প্রকারের পর্দা ভয়, ভক্তি ও ভালবাসা এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। আল্লাহ্তায়ালাকে লাভ করিতে হইলে এই সকল আবরণের পিছনে অনুসন্ধান করিতে হইবে। আবরণের পর আবরণ অপসারণ করিয়া যাইতে হইবে। ভয়ের পর ভয়ের বিকর্ষণ এবং ভক্তি ও ভালবাসার আকর্ষণের পর আকর্ষণ আসিয়া পথ রোধ করিবে। বিস্ময়ের পর বিস্ময় আসিয়া যাত্রীকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে। কিন্তু কলেমার উল্লিখিত প্রথম শব্দ 'এ নহে' 'এ নহে' বলিয়া আগাইয়া যাইতে হইবে। তাহার চলা থামিবে না। সত্যের অনুসন্ধানে তাহার আত্মার শান্তি। আল্লাহ্তায়ালার বিধানে সত্যান্বেষণের পিপাসা আমাদিগের শিশু মনেই উপ্ত হয়। লুকোচুরি শিশুদের বড়ই প্রিয় খেলা। আড়াল দিয়ে লুকিয়ে চলা, আড়াল অপসারণ করে গুপ্তকে প্রকাশ করা, উভয়ই তাহাকে আনন্দ

দেয়। বয়ঃবৃদ্ধির সহিত উন্নত আকারে এ খেলা জীবনের নানা ক্ষেত্রে আমাদিগকে বড়ই আমোদ দেয়। অনুসন্ধানের পিপাসা আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগের স্বভাবে এই জন্য নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন যেন, ইহা আমাদিগের আধ্যাত্মিক জীবনেও কম্পাসের কাঁটার ন্যায় আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে সদা সঙ্কেতশীল থাকে। 'না' অর্থাৎ ত্যাগের অস্ত্র আমাদিগের অনন্ত যাত্রা পথের সহায়। অনেক সময়ে ত্যাগে আমাদিগের অক্ষমতা দেখিয়া আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং অনেক চাওয়ার বস্তু হইতে আমাদিগকে নিষ্ঠুরের ন্যায় বঞ্চিত করিয়া আপন মুখের অনেক আবরণ সকরুণ হস্তে সরাইয়া দেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গাহিয়াছেন,

"আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভরে।"

বঞ্চিত ব্যক্তির মনে অহরহ আল্লাহ্‌তায়ালার নাম ধ্বনিত হইতে থাকে। এতদ্বারা বঞ্চিত ব্যক্তির হৃদয় এই সাক্ষ্যই দেয় যে, বহু বাসনার চাওয়া বস্তুগুলি, যাহারা তাহার হৃদয়কে রাহুগ্রস্থ করিয়া রাখিয়াছিল, উহারা কেহই উপাস্য নহে। উপাস্য আল্লাহ্, যাঁহার নাম এখন তাহার রাহুমুক্ত হৃদয়ে অহরহ ধ্বনিত হইতেছে। ইহাই সত্যকারের "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" কলেমা পাঠ। বিপদকালে যখন দুনিয়া তাহার সব আলো নিয়াও বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির চোখে অমাবশ্যা নামাইয়া আনে, তখন তাহার হৃদয়তন্ত্রীতে স্বাভাবিকভাবে যাঁহার নাম আপনি বাজিতে থাকে, তিনি হইলেন "আল্লাহ্"। রিক্ত, অসহায় ও নিঃস্ব হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম হইল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" কলেমার সাক্ষ্য দেওয়া। কিন্তু এইখানেই শেষ নহে। ইহা আরম্ভ মাত্র। অসহায় হৃদয় এই কলেমার সাক্ষ্য দিয়া আগে পথ পাইবার জন্য মাথা আছড়াইতে থাকে। আসমান হইতে সে পথ আল্লাহ্‌র রসুলের মারফৎ নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উর্ধে উঠিবার

সাক্ষী। এইরূপ কলেমার অধিকারীগণের দ্বারাই জগতে বিস্ময়কর কীর্তি স্থাপিত হয়। যদি কলেমাকে আমাদিগের জীবনে এক মূর্তিমান আদর্শ করিয়া তুলিতে পারি, তবেই আমরা জীবনে সফলকাম হইব এবং আল্লাহ্তায়ালাকে লাভ করিব। আমরা কলেমার ফজিলত সম্বন্ধে এই প্রবন্ধের গোড়ার দিকে যে হাদিস বর্ণনা করিয়াছি, উহাতেও ইহা স্পষ্ট বলা আছে যে, অপকট হৃদয়ে বিশ্বাস করিয়া কলেমার সাক্ষ্য প্রদানকারী ও উহাতে যে কায়েম থাকে তাহারই জন্য বেহেশ্ত নির্দিষ্ট। এই সকল কথা বেহেশ্তকামীকে কর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দিতেছে।

আল্লাহ্তায়ালা এবং মানবের মধ্যে অসংখ্য তামস ও জ্যোঃতির পর্দা বিরাজমান। তামস পর্দাগুলি নফস হইতে উদ্ভূত এবং জ্যোঃতির পর্দাগুলি আসমান হইতে বিলম্বিত। তামস পর্দাগুলি আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্বের উপর মানব মনে যবনিকা টানিয়া রাখে এবং আলোকের পর্দাগুলি অপরিষ্কৃত ও অপরিপক্ক হৃদয়ে খোদা ভ্রমের সৃষ্টি করে। উভয় প্রকারের পর্দা ভয়, ভক্তি ও ভালবাসা এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। আল্লাহ্তায়ালাকে লাভ করিতে হইলে এই সকল আবরণের পিছনে অনুসন্ধান করিতে হইবে। আবরণের পর আবরণ অপসারণ করিয়া যাইতে হইবে। ভয়ের পর ভয়ের বিকর্ষণ এবং ভক্তি ও ভালবাসার আকর্ষণের পর আকর্ষণ আসিয়া পথ রোধ করিবে। বিস্ময়ের পর বিস্ময় আসিয়া যাত্রীকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে। কিন্তু কলেমার উল্লিখিত প্রথম শব্দ 'এ নহে' 'এ নহে' বলিয়া আগাইয়া যাইতে হইবে। তাহার চলা থামিবে না। সত্যের অনুসন্ধানে তাহার আত্মার শান্তি। আল্লাহ্তায়ালার বিধানে সত্যান্বেষণের পিপাসা আমাদিগের শিশু মনেই উপ্ত হয়। লুকোচুরি শিশুদের বড়ই প্রিয় খেলা। আড়াল দিয়ে লুকিয়ে চলা, আড়াল অপসারণ করে গুপ্তকে প্রকাশ করা, উভয়ই তাহাকে আনন্দ

দেয়। বয়ঃবৃদ্ধির সহিত উন্নত আকারে এ খেলা জীবনের নানা ক্ষেত্রে আমাদিগকে বড়ই আমোদ দেয়। অনুসন্ধানের পিপাসা আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগের স্বভাবে এই জন্য নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন যেন, ইহা আমাদিগের আধ্যাত্মিক জীবনেও কম্পাসের কাঁটার ন্যায় আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে সদা সঙ্কেতশীল থাকে। 'না' অর্থাৎ ত্যাগের অস্ত্র আমাদিগের অনন্ত যাত্রা পথের সহায়। অনেক সময়ে ত্যাগে আমাদিগের অক্ষমতা দেখিয়া আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং অনেক চাওয়ার বস্তু হইতে আমাদিগকে নিষ্ঠুরের ন্যায় বঞ্চিত করিয়া আপন মুখের অনেক আবরণ সকরুণ হস্তে সরাইয়া দেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গাহিয়াছেন,

"আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভরে।"

বঞ্চিত ব্যক্তির মনে অহরহ আল্লাহ্‌তায়ালার নাম ধ্বনিত হইতে থাকে। এতদ্বারা বঞ্চিত ব্যক্তির হৃদয় এই সাক্ষ্যই দেয় যে, বহু বাসনার চাওয়া বস্তুগুলি, যাহারা তাহার হৃদয়কে রাহুগ্রস্থ করিয়া রাখিয়াছিল, উহারা কেহই উপাস্য নহে। উপাস্য আল্লাহ্, যাঁহার নাম এখন তাহার রাহুমুক্ত হৃদয়ে অহরহ ধ্বনিত হইতেছে। ইহাই সত্যকারের "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" কলেমা পাঠ। বিপদকালে যখন দুনিয়া তাহার সব আলো নিয়াও বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির চোখে অমাবশ্যা নামাইয়া আনে, তখন তাহার হৃদয়তন্ত্রীতে স্বাভাবিকভাবে যাঁহার নাম আপনি বাজিতে থাকে, তিনি হইলেন "আল্লাহ্"। রিক্ত, অসহায় ও নিঃস্ব হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম হইল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" কলেমার সাক্ষ্য দেওয়া। কিন্তু এইখানেই শেষ নহে। ইহা আরম্ভ মাত্র। অসহায় হৃদয় এই কলেমার সাক্ষ্য দিয়া আগে পথ পাইবার জন্য মাথা আছড়াইতে থাকে। আসমান হইতে সে পথ আল্লাহ্‌র রসুলের মারফৎ নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উর্ধে উঠিবার

সেই সিড়ি 'মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'। যাহারা এই স্বর্গীয় সিড়ির আশ্রয় গ্রহণ ক'রে, তাহারা গন্তব্য পথে আগাইয়া যায় এবং যাহারা না করে, তাহারা বিপমুক্তির জন্য জড়কে আঁকড়াইয়া ধরে এবং প্রকৃতির নিয়মে বিপদ কাটিবার পর পুনরায় জড়ের আঁধারে ডুবিয়া যায় এবং অনেকে বিপদমুক্ত হইতে না পারিয়া এবং পথও না পাইয়া আঁধারে তলাইয়া যায়।

যাহারা আল্লাহ্তায়ালার দিকে অগ্রসর হয়, তাহাদিগকে আল্লাহ্-তায়ালা মাঝে মাঝে স্বীয় প্রেমের নিদর্শন দিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল নিদর্শনের ঝলক সময় সময় আমাদিগকে এরূপ আনন্দ ও আত্মপ্রসাদে নিমগ্ন করে যে, আমাদিগের চলা থামিয়া যাইতে চায়। তখন আবার আল্লাহ্তায়ালা সাময়িক ভাবে নিদর্শনের প্রকাশ বন্ধ করিয়া হৃদয়তন্ত্রীতে টান দিয়া তাহাতে সহজ সুর তুলিয়া পুনরায় আমাদিগকে আগাইবার সুযোগ দেন। যেমন তিনি আমাদিগকে জড় সুখের অতি ইচ্ছার সঙ্কট হইতে বঞ্চনা দিয়া বাঁচান, তেমনি তাঁহাকে লাভ করার আধা ইচ্ছার সঙ্কট হইতেও বাঁচাইবার জন্য আমাদিগকে তিনি আধ্যাত্মিক কল্যাণ হইতে সময়ে সময়ে বঞ্চিত করিয়া থাকেন। এই উভয় অবস্থাতেই হযরত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্কে আমাদিগের সম্মুখে আদর্শরূপে রাখিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা সফলতার সহিত আগাইয়া যাইব।

আল্লাহ্তায়ালা অল্প বিস্তর প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে স্বীয় নূরের প্রকাশ করিয়াছেন। সেইজন্য অজ্ঞ মানুষ প্রত্যেক বস্তুতেই এরূপ ভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, যেন উহাই তাহার চরম আরাধ্য। কিন্তু যাহারা কলেমার হকিকত লাভ করে, তাহাদিগকে কোন কিছুতেই ভুলাইতে পারে না। তাহাদিগের আমল আল্লাহ্তায়ালার জন্য যেন কবির ভাষায় গাহিতে থাকে—

আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে।

এ সত্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত হযরত ইব্রাহিম (আঃ)। তিনি স্বপ্নের মধ্যেই এ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। "অতএব রাত্রি আসিয়া যখন তাঁহাকে [হযরত ইব্রাহিম আঃ-কে] অভিভূত করিয়া ফেলিল (অর্থাৎ তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন)ঃ তিনি (স্বপ্নে) দেখিলেন একটি তারকা। তিনি বলিলেনঃ ইহাই কি আমার রব? কিন্তু যখন ইহা অস্ত গেল, তিনি বলিলেনঃ যাহারা অস্ত যায় আমি তাহাদিগকে ভালবাসি না। অতঃপর যখন চাঁদকে উঠিতে দেখিলেন, তিনি বলিলেনঃ ইহা কি আমার রব? কিন্তু যখন উহা অস্ত গেল তখন তিনি বলিলেনঃ যদি না আমার রব আমাকে পথ দেখাইতেন, তাহা হইলে আমি পথভ্রান্ত জাতির সামিল হইতাম। উহার পর যখন তিনি সূর্যকে উঠিতে দেখিলেন, তিনি বলিলেনঃ ইনি কি আমার রব? ইহাই কি সর্বাপেক্ষা বড়? অতএব ইহা যখন অস্ত গেল, তিনি বলিলেনঃ হে আমার কওম! তোমরা যে শেরক কর, তাহা হইতে নিশ্চয়ই আমি মুক্ত! নিশ্চয়ই আমি নিজেকে সঠিক ভাবে পূর্ণরূপে তাঁহার দিকে ফিরাইলাম, যিনি আসমান সমূহ এবং জমিন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি মুশরেকগণের মধ্যে নহি।" (সুরা আনাম, ৯ রুকু)। বস্তুতঃ দুনিয়ার সকল জ্যোতিঃ যখন নিবিয়া যায়, তখন যাঁহার জ্যোতিঃ নির্বাপিত হয় না এবং অন্তরে জ্বলিয়া উঠে, উহা হইল আল্লাহ্‌র জ্যোতিঃ। তিনিই সকল আলোর উৎস। তাঁহার আলো অনির্বান ও চিরউজ্জ্বল।

তওহিদতত্ত্ব সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে আর একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। সাবার রাণী সূর্যোপাসীকা ছিলেন। হযরত সোলায়মান (আঃ)

তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞান শিখাইবার জন্য তরঙ্গায়মান জল প্রবাহের উপর একটি স্বচ্ছ কাঁচ নির্ম্মিত প্রাসাদ বানাইলেন এবং তাঁহাকে আহ্বান করিয়া, উহাতে প্রবেশ করিতে বলিলেন। "তাঁহাকে (সাবার রাণীকে) বলা হইলঃ এই প্রাসাদে প্রবেশ করুন। কিন্তু যখন তিনি উহা (মেঝে) দেখিলেন, উহাকে গভীর জলরাশি মনে করিলেন এবং (সাঁতার দিবার জন্য) কাপড় গুটাইতে লাগিলেন। তিনি [হযরত সোলায়মান (আঃ)] বলিলেনঃ নিশ্চয়ই ইহা স্বচ্ছ কাঁচ নির্ম্মিত প্রাসাদ। তিনি (সাবার রাণী) বলিলেনঃ আমার রব! নিশ্চয়ই আমি নিজের উপর জুলুম করিয়াছি এবং সোলায়মানের সহিত আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পন করিতেছি, যিনি সারা বিশ্বের রব।" (সুরা নমল ৩ রুকু, শেষ আয়াত)। সাবার রাণী স্বচ্ছ কাঁচের মেঝেকে জলশ্রোত বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। এই ভ্রম সংশোধনের পর তিনি বুঝিলেন, আলো ও উত্তাপের জন্য তিনি যে সূর্যকে পূজা করিয়া থাকেন, উহা এই সূর্যের নহে, পরন্তু যিনি ঐ আলো ও উত্তাপের স্রষ্টা, তিনি সূর্যের অন্তরালে রহিয়াছেন। তিনি আল্লাহ্ এবং উহার সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই উপাসনার একমাত্র যোগ্য।

আল্লাহ্‌তায়ালার পথে যখন আমরা একটির পর একটি আবরণ অপসারিত করিয়া আগে বাড়িয়া যাইতে থাকি, তখন নূতন নূতন আবরণ আসিয়া আমাদিগের পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়। পথের শেষ দিকে জন্মভূমি, স্ত্রী ও পুত্র অলঙ্ঘনীয় বাধার আকারে দেখা দেয়। প্রকৃত পক্ষে উহারা এবং প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহ্‌তালাকে লাভের পক্ষে সোপান স্বরূপ। উহারা প্রত্যেকেই আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতিফলিত আলোকের গুণে কাম্যের আকারে দেখা দেয়। কিন্তু উহাদের কেহই কাম্য বা উপাস্য নহে। যখন উহাদিগকে আমরা আল্লাহ্‌তায়ালাকে লাভ করার জন্য সোপান স্বরূপ ব্যবহার করি, তখন উহারা আমাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালার পথে

আগাইয়া দেয়। কিন্তু যখনই উহাদিগকে আমরা কাম্যের আসনে বসাই, তখনই উচ্চ সিঁড়ি হইতে স্খলিত ব্যক্তির ন্যায় আমাদিগের সর্ব্বনাশ হয়। তখন আমরা তাহাদিগকেও হারাই, খোদাকেও হারাই এবং নিজেদেরকেও হারাই। পরন্তু উহারা যখন উপাস্য আল্লাহ্তায়ালার মোকাবেলায় আসিয়া দাঁড়ায়, উহাদিগকে তখন তাঁহার নিকট কোরবানী করিতে হয়। ফলে উহারাও নষ্ট হয় না, যাত্রি নিজেও বাঁচে এবং আল্লাহ্কেও লাভ করে। হযরত ইব্রাহিম (আঃ) আমাদিগের জন্য বিবিধ বড় কোরবানীর আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি পত্নী হাজেরা এবং পুত্র ইসমাইল সহ হিযরত করিয়া জন্মভূমির মমতাকে কোরবানী করিয়াছিলেন। আল্লাহ্র আদেশে পত্নী ও পুত্রকে জল ও তৃণহীন মরুভূমির মধ্যে সুনিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া যান। পুনরায় ছুরি দ্বারা প্রিয় পুত্রকে আল্লাহ্র নামে কোরবানী করিবার চেষ্টা করেন। দেশ ত্যাগ করার ফল দেশবাসীর চক্ষে মৃত হওয়া এবং স্ত্রী ও পুত্রকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিক্ষিপ্ত করার ফল নির্ব্বংশ হওয়া ও ভবিষ্যৎ মানব জাতির মধ্যে মৃত হওয়া। আল্লাহ্তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য দেশ, স্ত্রী ও পুত্রের দুর্লঙ্ঘ্য ভালবাসার আকর্ষণকে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) সবল হাতে সরাইয়া দিয়াছিলেন। নির্ব্বংশ হওয়ার দুর্ভাগ্য হইতে বাঁচিবার জন্য মানুষ আপন রাজত্ব পর্যন্ত বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু তিনি আল্লাহ্তায়ালার জন্য স্বহস্তে সেই নির্ব্বংশ হওয়ার ব্যবস্থা অবলম্বন করাকেই পছন্দ করিলেন। আল্লাহ্তায়ালা ইহার পুরস্কারে একদিকে তাঁহার নামকে জগতে চিরস্মরণীয় ও অমর করিয়া দিয়াছেন এবং অপর দিকে তাঁহার বংশধরগণের সংখ্যার আজ আদি অন্ত নাই। তিনি আল্লাহ্তায়ালার জন্য জন্মভূমিকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উহার বিনিময়ে তাঁহার নামের সহিত যাঁহারা সংযুক্ত, আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাদিগেরই হস্তে দীন ও দুনিয়া উভয় রাজত্বের দণ্ড চিরকালের জন্য ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

এ পর্যন্ত আমি বাহিরের আকর্ষণের কথাই বলিয়া আসিয়াছি। মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু, আল্লাহ্‌তায়ালার পথে বড় বাধা, তাহার অন্তরে বিরাজমান। এ বাধা এরূপ দুর্লঙ্ঘ্য যে, ইহা পার হওয়া অসম্ভবের সামিল। ইহা মানুষের নফ্‌স। দুনিয়ার সব জঞ্জালের হাত হইতে উদ্ধার পাইলেও এ জঞ্জাল তাহাকে ছাড়ে না। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার কবিতায় নফ্‌সের এক সুন্দর ছবি আঁকিয়াছেন।

একলা আমি বাহির হলেম,
তোমার অভিসারে।
সাথে সাথে কে চলে মোর
নীরব অন্ধকারে।
ছাড়াতে চাই অনেক করে,
দূরে চলে যাই যে সরে,
মনে করি আপদ গেছে
আবার দেখি তারে।
ধরণী সে কাঁপিয়ে চলে,
বিষম চঞ্চলতা।
সকল কথার মধ্যে সে চায়,
কইতে আপন কথা।
সে যে আমার আমি, প্রভু,
লজ্জা তাহার নাই যে কভু,
তারে নিয়ে কোন্ লাজে বা
যাব তোমার দ্বারে।

হযরত বায়েজিদ বোস্তামি (রহঃ), তাঁহার নফ্‌সকে এড়াইবার জন্য অর্থাৎ আমিত্ব লোপ করিবার জন্য ৩০ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করেন। তাঁহার এই সাধনার সময় এক ব্যক্তি তাঁহার পরিচর্যার্থে ১২ বৎসর নিযুক্ত

ছিল। কিন্তু যখনই ঐ ব্যক্তি হযরত বায়েজিদের সম্মুখে উপস্থিত হইত, তখনই তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "তুমি কে?" এই ব্যবহারে ঐ ব্যক্তি মনে বড়ই কষ্ট অনুভব করিত। অবশেষে একদিন হযরত বায়েজিদকে সে বলিল, "হুজুর আমি বার বৎসর আপনার সেবা করিতেছি, অথচ আপনি আমাকে চিনিলেন না।" হযরত বায়েজিদ উত্তর করিলেন, "আমি আমার অন্তর হইতে সকল ছবি মুছিয়া ফেলিয়াছি, এখন বাকী আমার নফ্‌স। তাহাকে সরাইবার জন্য আমি ৩০ বৎসর চেষ্টা করিতেছি। এমতাবস্থায় তুমি কিরূপে আশা করিতে পার যে, তোমার ছবি আমার অন্তরে আবার প্রতিষ্ঠা করি।" এই ঘটনার দ্বারা নফ্‌সের নাছোড়বান্দা প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

প্রকৃতপক্ষে আমাদিগের নফ্‌স দুষ্ট গরু জাতীয়। গরু যেমন আপন পর বিবেচনা করে না, নফ্‌সও সেইরূপ কোন সীমারেখা মানিতে চায় না। গরু যেরূপ ভয় ও বাঁধনের দ্বারা অন্যায় হইতে দূরে রক্ষিত হয়, আমাদের নফ্‌সও তদ্রূপ ভয় ও বাঁধনের দ্বারা বশীভূত হয়। আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, কলেমার 'ইলাহ্' শব্দের এক অর্থ 'ভয়ের পাত্র'। এই শব্দে এই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, ভয়ের দণ্ড দ্বারা নফ্‌স বশীভূত হয়। পবিত্র কোরআন কলেমার বিস্তৃত ব্যাখ্যা স্বরূপ। নফ্‌স আমাদিগের মধ্যে শয়তানের প্রতিনিধি। ইহার গোলামী আমাদিগকে অভিশপ্ত ও পথভ্রান্ত করিয়া থাকে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে সুরা ফাতেহায় অভিশপ্ত ও পথভ্রান্ত হইবার আশঙ্কা হইতে রক্ষা পাইবার প্রার্থনা শিখাইয়া এ সম্বন্ধে প্রথমেই যে সুরার অবতারণা করিয়াছেন, উহাকে সুরা বকর অর্থাৎ 'গরু' আখ্যা দিয়াছেন। ইহাতে একদিকে বনি ইসরাইল কওমের অভিশপ্ত ও পথভ্রান্ত হইবার বিবরণ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং অপরদিকে নফ্‌সকে বশীভূত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ভীতি

প্রদর্শন ও উহাকে বাঁধিবার জন্য মজবুত বিধানের ব্যবস্থা পত্রও দেওয়া হইয়াছে। বনি ইসরাইল কওমের আধ্যাত্মিক ব্যাধির চরম প্রকাশ গো-মূর্তী পূজায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বনি ইসরাইল কওম নফ্‌সের মূর্তীমান প্রতীক ছিল। নফ্‌সের হাত হইতে বাঁচিবার পথ, কলেমা নির্দেশিত হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আদর্শ। তিনি বলিয়াছেন, "আমার জীন মুসলমান হইয়া গিয়াছে।"

অনেকে হয়ত কৌতুহল প্রকাশ করিবেন যে, নফ্‌স কাহাকে বলে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক মানুষকে ত্রিরূপধারী বলিয়াছেন, "এবং যখন তুমি কোন কথা উচ্চারণ কর; তখন নিশ্চয় তিনি জানেন (তোমার মনের) গোপন কথা এবং তাহা অপেক্ষা আরও লুক্কায়িত।" (সুরা তাহা, ১ম রুকু; সুরা তাগাবুন, ৫ম আয়াত)। মানুষের প্রথম রূপ, তাহার কথা ও কাজ দিয়া বাহিরের জগৎ তাহাকে যে ভাবে দেখে। দ্বিতীয় রূপ—সে নিজের মনে নিজকে যে ভাবে জানে। তৃতীয় রূপ—তাহার ফিতরত বা প্রকৃত স্বরূপ—যে রূপে সে সৃষ্ট হইয়াছে, যাহা তাহার বহির্জগৎ বা নিজে এ দুইয়ের কেহই জানে না। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার এই তিনরূপ সম্বন্ধেই অবগত। মধ্যবর্তীরূপে সে সদাই বহির্জগতের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া থাকে এবং বাহিরের দ্বারা প্রবল ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া জড় রঙে রঙিন হয় এবং উহার গতি সদা জড় মুখী হইতে চাহে এবং ইহা মন্দের দিকে আহ্বান জানায়। ইহাকেই নফ্‌স বলে। মানুষ যখন নবীর অনুগমন করে, তখন তাহার নফ্‌স ফিতরতমুখী হয় এবং নফ্‌সের তাজকিয়া বা দলনের ফলে সে 'বাকা' ও 'লেকা' অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যে অবস্থায় তাহার তিনরূপ এক আকার ধারণ করে। এই অবস্থায় তাহার প্রত্যেক চিন্তা ও কাজ স্বাভাবিক ভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশানুযায়ী আপনা আপনি হইতে থাকে। ইহাই সেই অবস্থা যাহার সম্বন্ধে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বলিয়াছেন,

"আমার জীন মুসলমান হইয়া গিয়াছে।" এইরূপ সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির নফ্‌স হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অসৎকর্মের প্রতি ঘৃণা ও সৎকর্মের জন্য আগ্রহ ফুটিয়া উঠে। বস্তুতঃ বিকৃত নফ্‌স খোদার আসনে দখল জমাইতে চাহে। আল্লাহ্‌তায়ালার নবী আসিয়া আমাদের অন্তরস্থিত খোদার এই জাল প্রতিদ্বন্দ্বীকে মারিয়া পরে বাহিরের মিথ্যা মাবুদগুলিকে ধ্বংস করে। প্রথমে মানুষের অন্তর-রাজ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদত প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার পর বাহির রাজ্যে। কলেমায় এই কথাই বলা হইয়াছে যে, রসুলের আবির্ভাবে আল্লাহ্‌তায়ালা ছাড়া সকল মিথ্যা মাবুদ ধ্বংস হইয়া যায়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন, "বল, সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা দূরীভূত হইয়াছে, নিশ্চয় মিথ্যা দূরীভূত হওয়ার বস্তু ছিল।"

—(সুরা বনি ইসরাইল)।

ইবলিস, নমরুদ, সাদ্দাদ, ফেরাউন ও আবু জেহেল, আপন আপন যুগের মানব নফ্‌সের মূর্তিমান প্রতীক ছিল এবং তাহারা আপন প্রাধান্য বজায় রাখিতে আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদত প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি প্রয়োগে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। আশ্চর্য তাহাদিগের বুদ্ধি বিপর্যয়। দুনিয়ায় যে সব উপকরণ আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষকে দিয়াছেন এবং যাহা সদা আল্লাহ্‌তায়ালার ক্ষমতাধীন, উহাদিগেরই সাহায্যে নফ্‌সের প্রতীকগণ খোদার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া তাঁহার আসন দখল করিতে চাহে। নিজেদের খোদায়ী বজায় রাখিতে যাইয়া দুনিয়ার উপকরণকে আপন রক্ষাকর্তা বানাইয়া বসে। তাহারা এই সহজ কথা বুঝে না যে, মালিকের বিরুদ্ধে দাস কোন সাহায্যে আসে না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা নানা স্থানে পার্থিব বস্তুর কসম খাইয়া ইহাই বুঝাইয়াছেন যে, মানুষের সেবায় সৃষ্টিকে নিয়োজিত করার ফলে বিকৃত প্রকৃতির মানব স্বাভাবিক ভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার শুকুরগুজারি না করিয়া, তদ্বারা তাঁহার আসন দখল করিতে চাহে। কিন্তু এই সকল বস্তু কখনও আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুমের

বিরুদ্ধে যায় না ও যাইবে না। কারণ তাহারা সৃষ্ট এবং সৃষ্টিকর্তার সদা আদেশাধীন। ইতিহাস ইহার সাক্ষী যে, আল্লাহ্তায়ালার সত্য এবাদত প্রতিষ্ঠার জন্য দুনিয়ায় যখন নবীর আবির্ভাব হয়, তখন তাঁহার মোকাবেলায় সমস্ত মিথ্যা মাবুদ উড়িয়া যায়। মিথ্যা উপাস্য ও উপাসক ধ্বংস হইয়া কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্" প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ সত্য মাবুদ আল্লাহ্তায়ালার এবাদত প্রতিষ্ঠাকল্পে রসুলের আবিভাবে সকল মিথ্যা মাবুদ স্বাভাবিক মরণে মরিয়া যায়। দেওয়ালীর সময়ে সন্ধ্যা প্রদীপে পতঙ্গ যেরূপ ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মাহুতি দেয়, তাহারাও তদ্রূপ করিয়া থাকে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়া দেখিলে, সূর্যোদয়ের সহিত উহার ultra violet রশ্মিতে যেরূপ অনেক শক্ত রোগের বীজাণু মরিয়া যায়, বিরুদ্ধবাদীগণও তদ্রূপ আল্লাহ্তায়ালার জ্যোতিঃস্ফূরণের সহিত বিনষ্ট হইয়া যায়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা বদরের যুদ্ধে নিহত বিরুদ্ধবাদীগণের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "অতএব তোমরা তাহাদিগকে নিহত কর নাই, পরন্তু আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে নিহত করিয়াছিলেন।" (সুরা আনফাল, ২য় রুকু)। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে সত্য স্বপ্নে মক্কার সরদারগণকে পূর্ব হইতেই মৃত দেখান হইয়াছিল এবং তিনি ইহার ঘোষণাও করিয়াছিলেন। আবু জেহেল এবং আবু লাহাব তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম ছিল। আবু লাহাব ঘোষণা-বাণী শুনিয়া ভীত হইয়া যুদ্ধে আসিতে চাহে নাই। কিন্তু মক্কাবাসীদের বিদ্রূপের খোঁচায় তাহাকে আসিয়া বদরের যুদ্ধে মরণ বরণ করিতে হয়। গীতায় আছে অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কুরুকুলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিতে অস্বীকার করেন, কারণ তাহারা স্বজন ছিল। তখন তাঁহাকে স্বপ্নযোগে কুরুক্ষেত্রের মাঠ দেখান হয়। তিনি দেখিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে কুরুকুল মরিয়া পড়িয়া আছে এবং শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহাকে এই দৃশ্য দেখাইয়া বলিতেছেন, "ইহারা তো মরিয়া রহিয়াছে।

ইহাদিগকে তুমি মারিতে পশ্চাৎপদ হইতেছ কেন?" তখন অর্জ্জুনের জ্ঞান হইল এবং অর্জ্জুন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এই ঘটনা ইহাই প্রমাণ করিয়া দেয় যে, ঐশিবিকাশের সহিত মিথ্যা উপাস্য নষ্ট হইয়া যায়।

শেষ জামানায় সত্য ধ্বংস প্রয়াসকারীকে দাজ্জাল নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দাজ্জালের প্রকাশ সকল ধর্মপুস্তকে সর্বাপেক্ষা ভীষণ বলিয়া বর্ণিত আছে। বস্তুতঃ মানব জাতির ক্রমোন্নতির সহিত ভোগের সামগ্রী বাড়িয়া যাওয়ার ফলে আল্লাহ্তায়ালা ও মানবের মধ্যে আবরণের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়িয়া চলিতেছে। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা আপন অপার করুণায় যুগ-নবীর মারফৎ তাঁহাকে লাভ করার পথও মানবের জন্য সহজ করিয়া আনিয়াছেন। দাজ্জালের ভয়াবহ প্রকাশের মোকাবেলায় পথের সন্ধান ও সাফল্যের শিক্ষা কলেমার মধ্যেই আছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় কলেমা আজ মুসলমানদের হাতে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে একদল আছে, যাহারা কলেমাই জানে না। এ সম্বন্ধে একটি কাহিনী মনে পড়িল। এক বেনিয়া ও এক পাঠানের মধ্যে ঝগড়া ছিল। পাঠান বেনিয়াকে একা পাইবার সুযোগের সন্ধানে ছিল। একদিন সুযোগ মিলিয়া গেল। একা পাইয়া পাঠান বেনিয়াকে আক্রমণ করিয়া চিৎ করিয়া ফেলিয়া বুকে চাপিয়া বসিল এবং ছোরা বাহির করিয়া বলিল, "বেটা বেনিয়া। অনেক চেষ্টার পর আজ তোকে কাবুতে পাইয়াছি। এবার কলেমা পড়িয়া মুসলমান না হইলে, তোকে এই ছোরা দিয়া মারিয়া ফেলিব।" বেনিয়া বেগতিক দেখিয়া বলিল, "আচ্ছা ভাই! আমি তো কলেমা জানি না; তুমি কলেমা পড়িয়া শুনাও, আমি তোমার সাথে সাথে পড়িয়া যাই।" পাঠান বেনিয়ার এই উত্তরে বিপদে পড়িল। পাঠান নিজেই কলেমা জানে না। নিরুপায় হইয়া পাঠান বেনিয়াকে ছাড়িয়া দিল

এবং বলিল, "তোর ভাগ্য বড় ভাল; আমি নিজেই কলেমা জানি না, নচেৎ আজ তোর নিস্তার ছিল না।" এ কথা শুনিয়া অনেকে হাসিবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ এমন অনেক মুসলমান পাওয়া যাইবে, যাহারা কলেমা জানে না। আর একদল মুসলমান আছে, যাহারা পীর পূজা করিয়া থাকে। এই সকল পীর তাহাদের শিষ্য-দিগকে যে মন্ত্র শিক্ষা দেয়, তাহা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর শেখান কলেমা নহে। তৃতীয় দল—কলেমা জানে, কিন্তু উহা তাহাদিগের নিকট অর্থহীন মন্ত্র। অবশিষ্ট দল উহার মোটা অর্থ বুঝে, কিন্তু জীবনে ইহার আবশ্যকতা সম্বন্ধে অজ্ঞ। সুতরাং মুসলমান জাতির মধ্যে ইসলামের সদর স্তম্ভ কলেমার স্বরূপ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বিচার করিলে দেখা যাইবে, বাকি চারিটি স্তম্ভের অবস্থাও আজ বড় সুবিধার নয়। অথচ আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহার দাজ্জালিয়তের সমস্ত অভিশাপ লইয়া জগতে প্রবল আকারে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর কলেমা উক্ত অভিশাপ দূর করিতে পূর্ণভাবে সক্ষম।

কিন্তু কলেমার উপর আমল করিবার মানুষ কোথায়। আল্লাহ্-তায়ালার আদিষ্ট কাজগুলি না করা এবং নিষিদ্ধ কাজগুলি করা আজ জগতের নিয়মে দাঁড়াইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে প্রত্যেক মানুষ আজ আত্মসুখের জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। নিজের সুখের নিকট আজ সমস্ত দুনিয়াকে সে রসাতলে দিতে কুণ্ঠিত নহে। নফ্‌স আজ তাহার বিকট মূর্তি ধারণ করিয়াছে। তাহার মাথা আজ আকাশে ঠেকিয়াছে। উহার মোকাবেলা করিয়া জগতে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবে কে? কলেমার বাহক বলিয়া যাহারা উপরে বর্ণিত হইয়াছে, বর্তমান অবস্থায় তাহাদিগের নিজেদের জীবনেই পরিবর্তন আনা সুকঠিন, অপরকে সত্যে আনা দূরের কথা। পৃথিবীতে একলক্ষ চব্বিশ হাজার আম্বিয়া ও কোটি কোটি পুণ্যাত্মা ব্যক্তি কলেমার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার জন্য

অশেষ নির্যাতন ভোগ ও কোরবানী স্বীকার করিয়াছেন। বিনা আয়াসে ও কষ্টে আজ সে কাজ কিভাবে সম্ভব? তবে কি ইসলাম আজ ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে প্রত্যেক বস্তুই যেমন নিম্নগামী তদ্রূপ মানুষের স্বভাবও নিম্নগামী হইতে চাহে। কোন বস্তুকে ঊর্ধে তুলিতে হইলে যেমন এক ঊর্ধ শক্তির সাহায্যের প্রয়োজন, তদ্রূপ অধঃপতিত মানব জাতি উদ্ধারের নিমিত্ত এক ঊর্ধ শক্তির মুখাপেক্ষী। দুনিয়ায় যখনই মানব জাতির কর্মধারা খোদার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং তাহার অবস্থা "নাই কোন মাবুদ" তারস্বরে ঘোষণা করে এবং মানবজাতি অধঃপতনের শেষ সীমার দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে থাকে, তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত কলেমার সূত্র অনুযায়ী তখনই আল্লাহ্তায়ালার প্রকাশ হয় এবং উহার জন্য 'রসুল' আবির্ভূত হন। এ যুগেও তাই আল্লাহ্তায়ালার চিরন্তন নিয়ম ও প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এক নবীর আবির্ভাব হইয়াছে। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্" স্থায়ী সত্য কলেমা। সেইজন্য হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) এর পর যখন যে কোন নবী হইবেন তিনি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর দর্পন স্বরূপ হইবেন। এই কথাই কলেমার "মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্" অংশে বলা আছে। মুসলমান যখন এই কলেমা নিহিত সত্যকে কর্মের দিক দিয়া অবহেলা করিয়া ইসলামকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষিপ্ত করিল, আল্লাহ্তায়ালা তখন চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি এ যুগে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর দর্পন স্বরূপ তাঁহার গোলাম হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-কে কলেমা ও ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

অনেকে মুসলমানদের অধঃপতনকে ইসলামের পতন বলিয়া মনে করিয়া থাকে এবং ধারণা করে যে, বর্তমান সভ্যতার যুগে ইসলাম

অচল। এখন মানবকে নিজে নূতন বিধান বানাইয়া লইতে হইবে। ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ধর্মকে ছাড়িয়া মনগড়া পথে চলিতে যাইয়াই আজ দুনিয়ার বিরূপ অবস্থা। সত্য কথা এই যে, ইসলাম হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার ফলে মুসলমানদের অধঃপতন হইয়াছে। যে পরিমাণ তাহারা ইসলাম হইতে ক্রমাগত দূরে সরিয়াছে, সেই পরিমাণ তাহাদিগের ক্রমশঃ অধঃপতন ঘটিয়া আসিয়াছে। ইসলামের আদেশ পালন করিয়া কেহ কখনও ক্ষতিগ্রস্থ বা অধঃপতিত হয় নাই এবং কখনও হইবে না। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ তাহার সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডার লইয়াও মানবকে শান্তি দিতে অক্ষম হইয়াছে। মানব জাতির জন্য আজ জগৎ নরক কুণ্ডবৎ হইয়াছে। হযরত মসিহ মাউদ (আঃ) আজ দেখাইতে আসিয়াছেন যে, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আজও জগতকে শান্তি দিতে সক্ষম। কলম ও দোয়াতের কসম খাইয়া আল্লাহ্তায়ালা এই কথাই পূর্ব হইতে বলিয়া রাখিয়াছেন। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর পদাঙ্কানুসরণে হযরত মসিহ মাউদ (আঃ) এক জামাত গঠন করিয়া গিয়াছেন। উহা আহ্মদীয়া জামাত নামে অভিহিত। মানব আজ দুনিয়ার কাজকে ধর্মের কাজের উপর প্রাধান্য দিয়াছে। তাই কলেমার পূর্ণ পালনের নিমিত্ত তিনি আমাদিগের নিকট হইতে প্রতিজ্ঞা লইয়াছেন, "ম্যায় দীন কো দুনিয়া পর মুকাদ্দাম রাখ্খুঙ্গা" অর্থাৎ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সব কিছু কোরবানী দিতে প্রস্তুত থাকিব। যে আদর্শ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন এবং মুসলমানগণ আমল দোষে হারাইয়াছিল, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) পুনরায় সে আদর্শ কোন পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন না করিয়া পূর্ণভাবে পেশ করিয়াছেন। জগতকে আজ আবার তাঁহার হাতে নূতন করিয়া সবক লইতে হইবে। এখন পরিত্রাণের উপায় তাঁহাকে গ্রহণ করা এবং তাঁহার দ্বারা পুনঃ প্রদর্শিত হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আদর্শ মানিয়া চলা। আমাদিগকে

আপন আপন জীবনে নূতন করিয়া কলেমাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আজ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য হইয়াছে আপন আপন মনে কলেমার সাক্ষ্যকে যাচাই করা। আম বলিতে ছোট, বড়, মিষ্ট, কাঁচা, পাকা এবং পচা সকল প্রকার আমকে বুঝায়। কিন্তু সুমিষ্ট আমই মানুষের কাছে আদরণীয়। সেইরূপ মনে মুখে ব্যবহারে বিকশিত কলেমা পাঠই আল্লাহ্তায়ালার নিকট মকবুল।

আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাকশক্তি যেরূপ মানবকে অপরাপর জীব হইতে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে, আল্লাহ্তায়ালার এবাদত যেরূপ হযরত আদম (আঃ)-এর পরবর্তী মানব জাতিকে তাঁহার পূর্ববর্তী মানব জাতি হইতে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে, সেইরূপ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) প্রদত্ত কলেমা ও তন্নিহিত শিক্ষাসহ পরিপূর্ণ ইসলাম পরবর্তী মানব জাতিকে তৎপূর্ববর্তী মানব জাতি হইতে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

হে বিশ্বের মুসলিম ভ্রাতাগণ! কলেমাকে আজ আমাদিগের জীবনে সত্য করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এই পথেই জগতের মুক্তি ও মানব জাতির শান্তি নিহিত। কলেমার উপর আমলের ফলেই পৃথিবীতে মানব জাতির জন্য প্রতিশ্রুত স্বর্গরাজ্য আসিবে। ব্যক্তি ও জাতির আকাঙ্খিত কল্যাণ এই পথেই নিহিত।

কথায় কথায় প্রবন্ধ বড় হইয়া গেল। কলেমার শব্দগুলির উপর চিন্তা করিয়া এক সীমাহীন আধ্যাত্মিক সমুদ্র অন্তরে উদ্বেল হইয়া উঠে, যাহার বর্ণনা লিখিয়া শেষ করা যায় না। আল্লাহ্তায়ালাকে লাভ করার জন্য মানবকে যে তিনটি আধ্যাত্মিক স্তর পার হইতে হয়, উহার সন্ধান, এই কলেমা হইতে দিয়াই কথা শেষ করিব।

তত্ত্বদর্শীর জন্য ফানা, বাকা ও লেকা এই তিনটি স্তর নির্দিষ্ট রহিয়াছে। কলেমার 'লা ইলাহা' অংশে 'ফানা', 'ইল্লাল্লাহ্' অংশে 'বাকা' ও 'মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' অংশে 'লেকার' দরজা বর্ণিত হইয়াছে। দুঃখ, কষ্ট, বিপদ, আপদ ও পরীক্ষার গুরু আঘাতে যখন নফ্‌স পিষ্ট হইয়া সকল বাসনা ও কামনার বস্তুকে পরিত্যাগ করে, তখন তার ফানার অবস্থা লাভ হয়। ঈদৃশ আত্মদমনের ফলে যখন নফ্‌স কথা বলা থামায়, তখন আমাদের প্রকৃতি সতেজ হইয়া উঠে। বাগানে একটি ফুলকে ফুটিতে দেখিয়া অপরাপর ফুলগুলি যেমন ফুটিতে থাকে, ঠিক সেই রকম নবীর মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার রূপকে ফুটিতে দেখিয়া আমাদিগের দ্বিতীয় রূপ অর্থাৎ প্রকৃতি ফুটিয়া উঠে এবং আমাদিগের বাকার অবস্থা লাভ হয়। মানব প্রকৃতি আল্লাহ্‌তায়ালার নিজের স্বরূপে সৃষ্ট। মানব যখন নিজেকে আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য ফানা অর্থাৎ বিলিন করে, যেরূপ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) করিয়াছিলেন, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে নষ্ট হইতে দেন না, পরন্ত তাহাকে বাকা (স্থায়িত্বের) অবস্থা দান করিয়া থাকেন। তখন তাহার সমস্ত কথা ও কাজ আল্লাহতায়ালার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ঐ অবস্থায় সে কোন অন্যায় করিতে পারে না। পূর্বে আমরা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছি। তাঁহার জন্য যখন হযরত রসুল (সাঃ) বলিলেন যে, "ইহার পর তিনি যাহাই করুন না কেন, তাহার জন্য আর তাঁহার কোন কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না" তিনি তখন একথা, এই অর্থেই বলিয়াছিলেন যে, এখন আর তিনি কোন অন্যায়ই করিতে পারেন না। ইহাই বাকার অবস্থা। এই অবস্থায় মানবের আমলগুলি আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশের আয়না স্বরূপ হয়। ইহাই কলেমার "ইল্লাল্লাহ্" অংশে বর্ণিত হইয়াছে। ঈদৃশ মানবের মধ্যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারও আদেশ ক্রিয়াশীল থাকে না। তখন তাহার স্বভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ রূপ ধরিয়া বসিয়া যায়। এই

কথা কলেমার "মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্" অংশে বর্ণিত হইয়াছে। মোমেনের এই অবস্থা সম্বন্ধে হাদিসে কুদসীতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন, "আমার বান্দা যখন নফল কাজ সমূহে আমার দিক ধাবমান হয়, তখন আমি তাহার কর্ণ হইয়া যাই, যাহার দ্বারা সে শ্রবণ করে, চক্ষু হইয়া যাই, যাহার দ্বারা সে দেখে, তাহার হাত হইয়া যাই, যাহার দ্বারা সে ধরে, এবং তাহার পা হইয়া যাই, যাহার দ্বারা সে চলে।" (বোখারী)। এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহ্তায়ালার শক্তি আসিয়া ঘর বাঁধে। তখন ঐ ব্যক্তি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর রঙে রঙিন হইয়া উঠে এবং তাহার লেকার অবস্থা লাভ হয়। এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার সহিত যে আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য লাভ করে, তাহার ফলে পরবর্তি কালের মানব সাধারণ তাঁহাকে খোদা ভ্রমে পূজা করে। নবীরা ইহার দৃষ্টান্ত। সে কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। করুণাময় খোদা মানব জাতিকে এই ভ্রম হইতে বাঁচাইবার জন্য ঐরূপ ব্যক্তির জীবনে এরূপ কঠিন পরীক্ষার সন্ধিক্ষণ আনেন, যখন তাঁহার মানবতা দ্বিধাহীন ভাবে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু অজ্ঞ ও গোঁড়া মানব সাধারণ, উক্ত ব্যক্তির জীবনে ঐরূপ দৃষ্টান্ত থাকা সত্বেও, তাঁহার পূজা করিতে থাকে। শূলে লম্বিত হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাতরোক্তি "ইলি ইলি লেমা সাবাক্তানি?" অর্থাৎ "হে প্রভো, হে প্রভো! তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?" তাঁহার মানব ব্যতিরেকে আর কিছুই না হওয়ার পরিচয়কে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। তথাপি আজ পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক মানুষ তাঁহাকে খোদা-রূপে পূজা করিতেছে। ঈদৃশ ভ্রান্ত মানব সমাজকে জ্ঞান দানের জন্য আল্লাহ্তায়ালার মর্যাদাবোধ তাই আজ মসিহ-এর নামে কিন্তু সর্বগুণে তাঁহা অপেক্ষা অধিক গুণান্বিত ও শক্তিশালী এক মহা-পুরুষকে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর গোলামীতে প্রেরণ করিয়াছেন।

আল্লাহ্তায়ালার একত্বের তরবারী সতর্ক প্রহরীর ন্যায় সদা উত্তোলিত রহিয়াছে। যে কেহ বা যাহা কিছু তাঁহার একত্বের মধ্যে দ্বিত্বের আসন পাতিবার প্রচেষ্টা করে বা সন্দেহ জাগাইবার সম্ভাবনা রাখে, তাহাকেই ঐ তরবারী বিনাশ করে, অথবা এক বা একাধিক উজ্জ্বল ও স্মরণীয় ঘটনার আঘাতে তাহার প্রকৃত স্বরূপকে উদঘাটিত করিয়া আল্লাহ্তায়ালার তৌহিদকে চির অম্লান রাখে। যে নবীর মধ্যবর্তীতায় আল্লাহ্তায়ালা নিজেকে প্রকাশ করেন, তিনিও আল্লাহ্-তায়ালার একত্বের বিকাশের ক্ষণে একান্ত অসহায় ও অস্তিত্বহীন হইয়া যান।

লেকার অবস্থা কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য নির্দিষ্ট নহে। ইহার দ্বার সকলের জন্য খোলা রহিয়াছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন, "বলঃ হে মোহাম্মাদ (সাঃ)ঃ আমি তোমাদেরই ন্যায় একজন মরণশীল মানুষঃ ইহা আমার নিকট ওহি করা হইয়াছে যে, তোমাদের উপাস্য একই, অতএব যে কেহ (তোমার ন্যায়) আপন রবের লেকা (মিলন) চাহে, সে যেন নেক আমল করে এবং আপন একক রবের শের্কমুক্ত এবাদত করে।" (সুরা কাহাফ, শেষ আয়াত)। দুই বন্ধু মিলিত হইলে তাহারা পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সুখালাপ করিয়া থাকে। কথার সাহায্যে আমরা পরস্পরকে দেখি এবং জানিতে ও চিনিতে পারি। বান্দার তরফ হইতে দোয়া ও আল্লাহ্তালায়ার তরফ হইতে ওহি সচল হওয়াকে ইহলোক লেকায়ে ইলাহি প্রাপ্ত হওয়া বলে। উপরোক্ত আয়াতে তোমাদের উপাস্য একই বলার উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্তায়ালা একমাত্র হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে পক্ষপাতিত্ব করিয়া লেকা দিয়াছেন, এমন নহে, পরন্তু তিনি সকলের জন্য এই পথ খোলা রাখিয়াছেন। "যাহারা বলেঃ আমাদিগের প্রভু আল্লাহ্ এবং উহাতে

কায়েম থাকে, তাহাদিগের উপর ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হয় (এই বাণী লইয়া), ভীত হইও না এবং দুঃখিত হইও না এবং শুভ সংবাদ গ্রহণ কর সেই জান্নাতের, যাহার ওয়াদা দেওয়া হইয়াছিল।" (হা-মিম সেজদা, ৪ রুকু)। উপরোক্ত আয়াত নির্দিষ্ট পথে যে চেষ্টা করিবে, সেই এই সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিবে। লেকা-প্রাপ্ত ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার শক্তিতে শক্তিমান হয়, যেরূপ ডায়নামোর সহিত সংযুক্ত বহু দূরে অবস্থিত বিজলির তারও ডায়নামোর শক্তিতে শক্তিমান হয়। এইরূপ ব্যক্তির অঙ্গুলি সংকেতে মহা প্রলয় ঘটে। বদরের যুদ্ধের সময় হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) প্রতিপক্ষের দিকে যখন প্রস্তর মুষ্টি নিক্ষেপ করেন, তখন উহা ঝড় তুফানে পরিণত হইয়া বিরুদ্ধবাদীগণের পরাজয়ের কারণ হইয়াছিল। বস্তুতঃ এইরূপ ব্যক্তির অঙ্গে হস্তক্ষেপ, স্বীয় অঙ্গে ক্ষতি হানে। আয়নার দিকে তাকাইয়া আয়নার ছবিকে আহত করিতে, যেমন নিজেকে আহত হইতে হয়, ইহা সেইরূপ। লেকা-প্রাপ্ত অবস্থায় মানব আল্লাহ্র এক আয়নাস্বরূপ হয়। উহার সম্মুখে কেহ দাঁড়াইলে তাহার মধ্যে নিজের রূপই দেখিবে এবং ঐ ছবির প্রতি সে যাহা করিতে চাহিবে, উহা নিজের উপর আসিবে। হযরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলিয়াছেনঃ—

"মুঝকো কাফের কাহকে আপনে কুফর পার কারতে হ্যাঁয় মোহর।
ইয়ে তো হ্যায় সাব শেক্‌ল উনকি ম্যায় তো হুঁ আইনা ওয়ার।।"

অর্থাৎ "আমাকে কাফের বলিয়া (তাহারা) আপন কুফরের মোহর মারিতেছে। এইগুলি তাহাদের আপন ছবি, আমি তাহাদের সম্মুখে

আয়না স্বরূপ।" সকল নবী আল্লাহ্তায়ালার সহিত লেকার অবস্থায় থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) সর্বাপেক্ষা বড় মিলন প্রাপ্ত পুরুষ ছিলেন। লেকার নানা স্তর আছে। সিদ্দিক, শহিদ এবং সালেহগণও মিলন প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি যে পরিমাণ নিজেকে আল্লাহ্তায়ালার পথে ফানা করেন, সেই পরিমাণ তাহার বাকা ও লেকা প্রাপ্তি হয়।

ব্যক্তি জীবনে যেরূপ ফানা, বাকা ও লেকার অবস্থা লাভ হয়, জাতীয় জীবনেও সেইরূপ হইয়া থাকে। যখন কোন জাতি, উপাস্য রবকে ছাড়িয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধচ্যুত হইয়া পড়ে, তখন এক নবী আসিয়া এক জামাত সৃষ্টি করেন, যাহাকে ফানা ও বাকার স্তর পার করিয়া আপেক্ষিক লেকার স্তরে কায়েম করিয়া যান। যে কোন ব্যক্তি বা জাতি ঐরূপ লেকা অবস্থাপ্রাপ্ত জামাতকে আঘাত হানিতে চাহে, সেই ব্যক্তি বা জাতি বিনষ্ট হইয়া যায়। নবীর মৃত্যুর কিছুকাল পর, তাঁহার জামাত কলেমার উল্টা স্রোতে দুনিয়ার দিকে চলিতে থাকে। ফলে, ক্রমে উহা লেকার অবস্থা হইতে নামিয়া বাকার (শরিয়তের অনুশাসন মানিয়া চলার সাধারণ) অবস্থা এবং সেখান হইতে শরিয়ত ভাঙ্গিয়া ভ্রান্তির অবস্থায় পতিত হইয়া যায়। তখন আবার আল্লাহ্তায়ালার রহমত উদ্বেল হইয়া উঠে এবং তিনি পুনরায় নবী প্রেরণ করেন। তিনি আবার এক জামাত গঠন করিয়া উহাকে লেকার অবস্থায় রাখিয়া যান। এই চক্র চিরন্তন এবং আজও কায়েম আছে। কিন্তু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর

পর যে কোন নবী আসিবেন, তাঁহাকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্" কলেমার পবিত্র ও পূর্ণ জোয়াল স্কন্ধে বহন করিয়া আসিতে হইবে এবং তাঁহাকে এই কলেমাই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আজ হযরত মসিহ মাউদ (আঃ) সেই উদ্দেশ্যেই আসিয়াছেন এবং উহা পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহাকে গ্রহণ করার মধ্যেই আজ জগতের উদ্ধার নির্দিষ্ট।

পাঠক! এখন দেখিলেন ছোট একটি কলেমার মধ্যে কিভাবে অনন্ত পথের এবং অসীম ও অনন্ত আল্লাহ্‌কে লাভ করিবার সন্ধান দেওয়া আছে। আল্লাহ্‌তায়ালা সকল মুসলমান ভাইকে এই কলেমার সারমর্ম বুঝিবার তৌফিক দান করুন এবং অচিরে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হউক। আমীন! এবং আমাদের শেষ কথা এই যে, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার, যিনি বিশ্বের রব (প্রতিপালক)।

সমাপ্ত

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর

একটি ভবিষ্যদ্বাণী

"স্মরণ রাখিও, খোদাতায়ালা আমাকে সাধারণভাবে ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়াছেন। সুতরাং নিশ্চয় জানিও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যেমন আমেরিকায় ভূমিকম্প আসিয়াছে, সেইরূপ ইউরোপেও আসিয়াছে এবং এশিয়ারও বিভিন্ন এলাকায় আসিবে। উহাদের মধ্যে অনেকগুলি কেয়ামতের নমুনাস্বরূপ হইবে এবং এরূপ মৃত্যু সংঘটিত হইবে যে রক্তের স্রোত প্রবাহিত হইবে। এই মৃত্যু হইতে পশুপক্ষীও রক্ষা পাইবে না এবং পৃথিবীতে এরূপ ধ্বংস দেখা দিবে যে, যেদিন হইতে মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে, সেদিন হইতে এইরূপ ধ্বংস কখনো আসে নাই, এবং অধিকাংশ স্থান ওলট-পালট হইয়া যাইবে; দেখিয়া মনে হইবে যেন উহাতে কখনো কোন অধিবাসী ছিল না। ইহার সহিত আকাশ ও পৃথিবীর আরো বহুবিধ বিপদ গুরুতর আকারে প্রকাশ পাইবে, যাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জ্যোতিষ ও দর্শনের পুস্তকে তাহার খোঁজ মিলিবে না। তখন মানুষের মধ্যে এক চাঞ্চল্য দেখা দিবে যে, পৃথিবীতে একি হইতে চলিল? অনেকে রক্ষাপ্রাপ্ত হইবে এবং অনেকে বিনষ্ট হইবে। সেইদিন সন্নিকটে এবং আমি উহাকে দ্বারদেশে উপস্থিত দেখিতেছি। তখন দুনিয়া কেয়ামতের দৃশ্য অবলোকন করিবে। শুধু ভূমিকম্পই নয়, বরং আরো ভীতিপূর্ণ বিপদাবলী প্রকটিত হইবে —কিছু আকাশ হইতে এবং কিছু ভূতল হইতে। ইহা এই জন্য হইবে যে, মানবজাতি আপন সৃষ্টিকর্তার উপাসনা ছাড়িয়া দিয়াছে এবং মনপ্রাণ ও শক্তি দিয়া পার্থিব বিষয়ে নিমজ্জিত হইয়াছে। যদি আমি না আসিতাম, তবে এই সকল বিপদরাশি আসিতে কিছু বিলম্ব ঘটিত; পরন্তু আমার আগমনের সঙ্গে খোদাতায়ালার ক্রোধের গোপন ইচ্ছা, যাহা বহুদিন যাবত লুক্কায়িত ছিল তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেনঃ—

"কোন সাবধানকারী প্রেরণ না করিয়া আমরা কখনো শাস্তি অবতীর্ণ করি না"। (কোরআন শরীফ)।

অনুতাপকারিগণ নিরাপদ থাকিবে এবং যাহারা বিপদ আসিবার পূর্বেই ভীত হয়, তাহাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। তুমি কি মনে করিয়াছ এই সকল ভূমিকম্প হইতে তুমি নিরাপদে বাঁচিয়া যাইবে বা স্বীয় প্রচেষ্টায় আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে? কখনো নহে। মানুষের চেষ্টা সে-দিন অচল হইবে। ইহা মনে করিও না যে, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে গুরুতর ভূমিকম্প আসিয়াছে, কিন্তু তোমাদের দেশ উহা হইতে নিরাপদ থাকিবে। আমি তো দেখিতেছি হয়ত তাহা হইতেও গুরুতর বিপদের মুখ তোমরা দেখিবে।

"হে ইউরোপ, তুমিও নিরাপদ নহ! হে এশিয়া, তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসীগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না। আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনমানবশূন্য পাইতেছি। সেই একমেবাদ্বিতীয়ম খোদা দীর্ঘকাল যাবত নীরব ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এবার তিনি রুদ্র মূর্তিতে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিবেন। যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবন করুক যে, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এদেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসিবে, লুতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে। কিন্তু খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নহে, কীট এবং যে তাঁহাকে ভয় করে না, সে জীবিত নহে, মৃত।"

(হকীকাতুল-ওহী ১৯০৬ খৃঃ, পৃঃ, ২৫৬—২৫৮)

প্রকাশক ঃ
সদর আঞ্জুমানের পক্ষ হইতে
মুহাম্মদ শামসুর রহমান,
এল·এল· বি· (লণ্ডন), বার-এট-ল·,
সেক্রেটারী, ইসলাহ ও ইরশাদ,
পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া,
৪নং, বক্‌সি বাজার রোড, ঢাকা—১

প্রথম সংস্করণ—১৯৬২ ইসাব্দ
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৬৬ ইসাব্দ

শাহজাহান প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৯৭/২, সিদ্দিক বাজার,
ঢাকা—২ হইতে এস· খান কর্তৃক মুদ্রিত।